ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক প্রকাশিত ফাইন্যান্সিয়াল সিক্রেসি ইনডেক্স ২০১৩

আর্থিক গোপনীয়তা রক্ষায় শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রসমূহ ও বাংলাদেশ

ক. প্রেক্ষাপট

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক' (টিজেএন) গত ৭ নভেম্বর ২০১৩ ফাইন্যান্সিয়াল সিক্রেসি ইনডেক্স ২০১৩ (FSI) নামে একটি সূচক প্রকাশ করে। এই সূচকের মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের গোপনীয়তা রক্ষায় বিভিন্ন দেশ বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর (Jurisdiction) ভূমিকা রেটিং করা হয়। এই সূচক ও সে সংক্রান্ড় প্রতিবেদনে ৮২টি দেশ বা জুরিসডিকশনের রেটিং অবস্থান প্রকাশ করা হয়।

এই প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে OECD (Orgnization for Economic Cooperation Development) দেশসমূহ কিভাবে বিভিন্ন দেশ হতে অবৈধ অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে নিজ দেশ বা অঞ্চলে অর্থ স্থানান্তর করে আনছে এবং ঐ সকল দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে দুর্বল এবং ঋণগ্রস্ড় করে তুলছে তার একটি চিত্র তুলে ধরা। পাশাপাশি এই সূচকটি হচ্ছে বৈশ্বিক আর্থিক গোপনীয়তা, ট্যাক্স হেভেন, অবৈধ অর্থ প্রবাহ ইত্যাদি বোঝার একটি কার্যকর কৌশল।

এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য না থাকলেও আমরা জানি, বাংলাদেশ হতেও মানি লন্ডারিং বা অবৈধ অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে ট্যাক্স স্বর্গরাজ্য নামে পরিচিত দেশসমূহে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে।

Global Financial Integrity (GFI) এর ২০১২ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০১ হতে পরবর্তি ১০বছরে বাংলাদেশ হতে প্রায় ১৪.০৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ১১২ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেছে বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে।

নিচে টিজেএন প্রকাশিত FSI-2013 অনুযায়ী কয়েকটি দেশ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও অঞ্চলের অর্থ গোনীয়তার ধরন আর্থিক স্বচ্ছতার তথ্য শতকরা হারে প্রকাশ করা হলো।

দেশের নাম	FSI সূচক	আর্থিক স্বচ্ছতা
সুইজারল্যান্ড	৭৮%	২২%
যুক্তরাজ্য	৪০%	৬০%
কেম্যান আইল্যান্ড (যুক্তরাজ্য)	৭০%	৩০%
ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	৬৬%	৩৪%
সিঙ্গাপুর	৭০%	৩০%
যুক্তরাষ্ট্র	৫৮%	৪২%
জার্সি (যুক্তরাজ্য)	৭৫%	২৫%
মালয়েশিয়া (লাবুয়ান)	৮০%	২০%
কানাডা	৫৪%	৪৬%
অস্ট্রিয়া	৬৪%	৩৬%
আরব আমিরাত (দুবাই)	৭৯%	২১%
জাপান	৬১%	৩৯%

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যাচ্ছে, উন্নত দেশ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশ বা অঞ্চলসমূহে অর্থনৈতিক তথ্য গোপন রাখার হার সবচেয়ে বেশি এবং পক্ষান্তরে আর্থিক স্বচ্ছতার হার তুলনামূলকভাবে কম।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন গোপনীয় অঞ্চলে (Secrecy Jurisdiction) ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমাণ ২১ হতে ৩২ ট্রিলিয়ন ডলার (১ ট্রিলিয়ন = ১ লক্ষ কোটি) পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে যারা কখনও কর দেয়নি বা অবৈধভাবে কর গোপন করেছে বা দিলেও নামমাত্র কর দিয়েছে।

১৯৭০ সালের পর থেকে শুধুমাত্র আফ্রিকা থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পাচার হয়েছে। অথচ আফ্রিকার মোট ঋণের পরিমাণ মাত্র ১৯০ বিলিয়ন ডলার (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) যা ঐ পাচারকৃত অর্থের কাছে খুবই নগণ্য।

এর ফলে আফ্রিকা সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্থ দেশ হিসেবে পরিণত হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত আছে গুটি কয়েক ধনী ব্যক্তির হাতে, যার ঋণভার বহন করছে গোটা আফ্রিকার জনগণ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, OECD দেশসমূহ জোর করে অনেক দেশকে দরিদ্র বানিয়ে রাখার চেষ্টায় লিপ্ত। এক হিসেবে দেখা গেছে, তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বৈদেশিক অনুদানের নামে বছরে ১৩০ বিলিয়ন ডলার প্রদান করলেও ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ অবৈধ প্রবাহের মাধ্যমে নিয়ে যাচ্ছে। ***অর্থাৎ তারা প্রতি ১ ডলার অনুদানের বিপরীতে ১০ডলার আদায় করে নিচ্ছে অনৈতিক অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে।***

প্রতিবেদনে বলা হয়, লন্ডন, নিউইয়র্ক ও জেনেভার মতো উন্নত বিশ্বের রাজধানীতে অবস্থিত বিশ্বের বড় বড় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর থেকেই এ ধরনের অর্থ পাচার উৎসাহিত করা হয়। এভাবে বিভিন্ন দেশের ধনীরা কর ফাকি দিচ্ছে আর গরীব মানুষরা সেই ঋণের বোঝা টানছে।

খ. বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান এবং অ্যাটর্নি জেনারেল মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা ও ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পন্থায় বিদেশে টাকা পাচার করছেন এবং অনেকে এসব অর্থ দিয়ে বিদেশে বিভিন্ন সম্পত্তি ক্রয় করছেন বা সেকেন্ড হোম বানাচ্ছেন। দেশে প্রচলিত মানি লন্ডারিং আইনে যা অপরাধ।

ইউএনডিপি বলেছে, অবৈধ পুঁজি পাচারে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষে (প্রথম আলো: ২৬মে, ২০১৩)। তার মানে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ নাজুক। কারণ, আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ব্যাংক-বহির্ভূত নগদ লেনদেনের প্রবণতাই বেশী। আমাদের প্রবাসী শ্রমিকদের শ্রম ও ঘামে অর্জিত বিশাল অংকের রেমিট্যান্স অনায়াসে আন্তর্জাতিক অর্থ পাচারের খপ্পড়ে পড়তে পারে যদি আমরা সেসব অন্তর্মুখী প্রবাহের উৎস সম্পর্কে সকর্ত না থাকি।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থনীতিবিদগণের গবেষণায় বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পরিমাণ মোট জিডিপি'র শতকরা ৪৮ ভাগ হতে ৮৪ ভাগ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলী দেশের উন্নয়নে তেমন কোন ভূমিকা তো রাখেই না এমনকি এই ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলী থেকে সরকার অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ, বিশেষ করে কাংখিত রাজস্ব আদায় করতে পারে না। যে কারণে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বাজেট ঘাটতি থাকে এবং ঋণের মাধ্যমে আমাদের উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করতে হয়।

গ. অপ্রদর্শিত অর্থনীতি এবং এর উৎস

সাধারণত সব ধরনের অনিবন্ধিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকেই অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি বা অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বলা হয়। অর্থাৎ যে সকল কর্মকান্ড করের আওতায় থাকলেও তা মানা হয়না বা করের আওতার বাইরে রাখা হয় তাকেও অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বলা যেতে পারে। অস্ট্রিয়ায় জোহানস কেপলার ইউনিভার্সিটি অব লিনজ-এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ফ্রেডারিক স্নাইডার দি ইকোনমিস্ট (১১-০৮-২০১০ সংখ্যা) পত্রিকায় বলেছেন, সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার পর করের আওতার বাইরে অর্থের লেনদেন অনেক বেড়েছে এবং এর ফলে বিশ্বব্যাপী অপ্রদর্শিত অর্থনীতির পরিমাণও বেড়েছে। বিশেষ করে উন্নত ও ধনী দেশগুলোতে এই প্রবণতা বেশী। OECD এবং ইরোপের মানুষ অতিরিক্ত কর ভার এড়ানোর জন্য ক্রমেই অপ্রদর্শিত লেনদেনে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদগণ সার্বিকভাবে বাংলাদেশে কলো টাকার অর্জনের নিম্নোক্ত উৎসের কথা বলে থাকেন।

অবৈধ বা অনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে	**বৈধ কিন্তু জাতীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়**
ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাচালান, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, সম্পত্তি দখল, রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসান, বেসরকারিকরণ, শিল্প স্থাপনের জন্য নেওয়া ঋণের অর্থ লুট, ওভার/আন্ডার ইনভয়েসিং, নগদ সহায়তা ও কর অবকাশ সুবিধার নামে বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে অর্থ আত্মসাৎ, আন্তর্জাতিক টেন্ডার চুক্তি, সরকারি কেনাকাটা, বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ লেনদেন, মুদ্রা পাচার ও হুন্ডি, মাস্তানি/চাঁদাবাজি/সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, চলচ্চিত্র ও হাউজিং ব্যবসা, সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে আইনের অপব্যবহার, কালোবাজারী, ভেজাল পন্য উৎপাদন ও বিক্রি ইত্যাদি।	পেশাজীবিদের অতিরিক্ত ফি, পুঁজির অতিরিক্ত আয়, অতিরিক্ত ব্যক্তিগত আয় ইত্যাদি।

ঘ. জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রদর্শিত অর্থের চিত্র

(১) ড. আবুল বারাকাত "বাংলাদেশে কালো টাকা এবং এর উৎস" নামে ২০০৬ সালে প্রণীত একটি প্রতিবেদনে বলেছেন, দেশে কলো টাকার পরিমাণ ১লক্ষ ৭৫হাজার কেটি টাকা এবং ব্যবসায়ী, আমলা, ক্রেতা-বিক্রেতা ও রাজনীতিবিদরা এসকল অপ্রদর্শিত অর্থনীতির সাথে জড়িত। নিচে তার দেয়া এ সংক্রান্ত একটি তালিকা তুলে ধরা হলো:

অনৈতিক পন্থায় লেনদেনের খাতসমূহ	**বাৎসরিক লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকা)**
দুর্নীতিসহ অনৈতিক পন্থায়	৪০,০০০
ঘুষ ও চোরাচালান	১২,০০০
বৈধ কাজে দুর্নীতির মাধমে অবৈধ আয়	৫৮,০০০
শুল্ক ফাঁকি	২৫,০০০
ব্যাংক, বীমা, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আবগারি কর ফাঁকি	১৬,০০০
আয়কর ফাঁকি	৭,০০০
আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে শুল্ক ফাঁকি	৬,০০০
স্ট্যাম্প, ভূমিকর, নিবন্ধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুর্নীতি	১,০০০
ভ্যাট ফাঁকি	৫০০

(২) অধ্যাপক ফ্রেডারিক স্নাইডার বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ২০১০ সালের জুলাই মাসে অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর "Shadow Econimies All Over the World : New Estimats for 162 Countries from 1999-2007'' নামে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছায়া অর্থনীতি তৈরি হচ্ছে মূলত সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং কর কাঠামোর অব্যবস্থার কারণে। এর ফলে অনেক মানুষ আনুষ্ঠানিক

অর্থনীতির বাইরে চলে যায়। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বিদ্যমান অপ্রদর্শিত/ছায়া অর্থনীতির চিত্র নিম্নরূপ:

বছর	জাতীয় অর্থনীতিতে ছায়া অর্থনীতির হার
২০০০-২০০১	৩৫.৭%
২০০১-২০০২	৩৫.৫%
২০০২-২০০৩	৩৫.৬%
২০০৩-২০০৪	৩৫.৭%
২০০৪-২০০৫	৩৬%
২০০৫-২০০৬	৩৬.৭%
২০০৭-২০০৮	৩৭%

মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পরবর্তি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেন, ২০১১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রদর্শিত অর্থের সর্বোচ্চ হার জিডিপি'র ৮৪% এবং সর্বনিম্ন হার জিডিপি'র ৪৮%। ***সর্বোচ্চ হারকে বিবেচনা করলে ২০১১ অর্থবছরে ছায়া অর্থনীতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,৬৮৪ বিলিয়ন টাকা এবং তার পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ২০১০ অর্থবছরে দাড়ায় ৬,৬২০ বিলিয়ন টাকা।***

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের এক সময়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন আই ওয়ালিক ২০০৬ সালে এক বক্তৃতায় বলেন, ***বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যয় বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। তিনি আরও বলেন, বিগত জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যয় করে ২০,০০০ কোটি টাকা বা ৩৩০ কোটি ইউএস ডলার, যা ঐ সময়ে মোট দেশজ উৎপাদনের ৫ শতাংশ। নির্বাচনের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ এসেছে মূলত দুর্নীতির মাধ্যমে।***

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান "ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক" তাদের একটি গবেষণায় উল্লেখ করে, ১৯৭৬ থেকে ২০১০ এই ৩৪ বছরে বাংলাদেশ হতে প্রায় ১৯৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয় এবং তা গচ্ছিত রাখা হয় ট্যাক্স হেভেন হিসেবে পরিচিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এই টাকার পরিমাণ ২০১২-১৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের চেয়েও বেশি।

দেখা যায়, ২০০০ সাল পর্যন্ত অন্তত ১,৮১০ কোটি ডলার পাচার করা হয় আর পরের ১০ বছরে সরানো হয় ৬৬০ কোটি ডলার। বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া আর্থিক সম্পদ বা পুঁজি ২০১০ সালে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত বিদেশি ঋণের প্রায় ৯৯%।
(প্রথম আলো ঃ ২৬/৭/২০১২)

বহুল আলোচিত হলমার্ক কেলেঙ্কারি সম্পর্কে সিপিডি বলেছে, রাষ্ট্রায়াত্ত একটি ব্যাংক থেকে হলমার্ক যে অর্থ নিয়ে গেছে, তা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৬.৬% এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ অর্থের প্রায় ১৬%। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও সুশাসনের অভাবে এ ধরনের কেলেংকারীর ঘটনা ঘটছে। (প্রথম আলোঃ ০৬/০১/২০১৩)

২০০২ সাল থেকে মালয়েশীয় সকার "সেকেন্ড হোম" কর্মসুচী চালু করেছে এবং ২০০২ হতে ২০১০ সাল অবধি কমপক্ষে ১,৮৬২জন বাংলাদেশি মালয়েশিয়ায় নাগরিকত্ব কিনেছে এবং তারা প্রায় ২,৩০০ কোটি টাকা ঐ দেশে নিয়ে গেছে (ডেইলি স্টার, ২৭/৪/২০১২)।

এভাবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর সহ ধনী বিশ্বের অংশ হয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের অনেক কালো টাকার মালিকেরা। ইউএনডিপি তাদের সমীক্ষায় উল্লেখ করে যে, বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সরকারি ক্ষমতার শেষ সময়ে এ ধরনের অর্থ পাচারের প্রবণতা বেড়ে যায়।

ঙ. যে পন্থায় অপ্রদর্শিত অর্থ সংরক্ষণ করা হয়

অপ্রদর্শিত অর্থনীতির ফলে অর্জিত অর্থ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে সংরক্ষন করা হয়, যেমন-

(১) গোপন ব্যাংক হিসাবঃ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ব্যাংকে চলতি/সঞ্চয়/এফডিআর ইত্যাদি হিসেবে নিজ নামে বা বেনামে বা আত্মীয়-স্বজনের নামে এই ব্যাংক অর্থ সংরক্ষন করা হয় এবং হিসেবের তথ্য কর কর্তৃপক্ষের কছে গোপন করা হয়।

(২) রিয়েল এস্টেটঃ অপ্রদর্শিত অর্থনীতির ফলে অর্জিত অর্থ ফ্লাট, জমি, বিল্ডিং, দোকান ইত্যাদি ক্রয়ে ব্যবহার হয় এবং তা নিকট আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বা বিশ্বস্থ ব্যক্তির নামে ক্রয় করা হয়।

(৩) স্টক বা শেয়ার ঃ এই অর্থ স্টক বা শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রেও নিকট আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বা বিশ্বস্থ ব্যক্তির নামে বিনিয়োগ করা হয়।

(৪) সঞ্চয়পত্র ক্রয় ঃ এই অর্থ নিকট আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বা বিশ্বস্থ ব্যক্তির নামে বিভিন্ন অংকের সঞ্চয়পত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়ে থাকে।

(৫) বিদেশে বিনিয়োগ ঃ এই অর্থ বেআইনি বিভিন্ন পন্থায় বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাচার হয়ে যায়।

(৬) নগদ ও স্বর্ণালংকার ঃ এই অর্থ নগদে, স্বর্ণ ক্রয়, অলংকার ক্রয় করার মাধ্যমে সংরক্ষন করা হয়।

(৭) সম্পদের প্রকৃত মূল্য গোপন করা ঃ এই অর্থ বিভিন্ন মূল্যবান ভোগ-বিলাস সামগ্রী এবং ব্যক্তিগত সম্পদ ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে নিজে বা বিক্রেতার যোগসাজসে সম্পদের প্রকৃত মূল্য গোপন করা হয়।

চ. অপ্রদর্শিত অর্থনীতি উদ্ধার ঃ ভারতের পদক্ষেপ

গত মে ২০১২ ভারত সরকার অপ্রদর্শিত অর্থনীতির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ভারত অপ্রদর্শিত অর্থনীতি উদ্ধারের লক্ষ্যে তাদের রাজস্ব নীতি, কর সংক্রান্ত আইন সহজিকরন, দক্ষ লোকবল, আইটি সেক্টর, আন্ত-দেশ তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যপক সংস্কার কার্যক্রম হতে নিয়েছে। ***ভারত আন্ত-দেশ ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ৮৮টি দেশের সহিত DTAAs (Double Taxation Avoidance Agreement) চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ২২টি দেশের সহিত TIEAs (Tax Information Exchange Agreement) চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ চুক্তির আওতায় ইতিমধ্যে আর্জেন্টিনা, বাহামা, বারমুডা, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, কেম্যান আইল্যান্ড, জার্সি, গোয়ার্নসি এবং লাইবেরিয়া ইত্যাদি দেশ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে TIEAs চুক্তি সম্পাদন করেছে***। নিচে TIEA এর আওতায় আদায়কৃত করের একটি টেবিল চিত্র দেয়া হলো,

বছর	রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (কোটি রুপি)
২০০২-০৩	১,৩৫৬
২০০৩-০৪	১,২৯০
২০০৪-০৫	৪,৪১৮
২০০৫-০৬	৮,০৪৯
২০০৬-০৭	৯,১৪৭
২০০৭-০৮	১১,৭৯০
২০০৮-০৯	১৫,৭৪০
২০০৯-১০	১৬,১৯৮
২০১০-১১	২১,৫০৯
২০১১-১২	২৭,৪৪২
Source: White paper on Black money, India 2012	

ছ. অপ্রদর্শিত অর্থনীতি এবং অবৈধ অর্থ স্থানান্তর বন্ধে আমাদের কিছু সুপারিশ

(১) Money Laundering বন্ধে যুৎসই এবং কার্যকরি আইন প্রনয়ন করা।

(২) তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করা।

(৩) নিরীক্ষা ফার্ম গুলোকে আরও বেশী জবাবদিহি করা এবং ভুল তথ্য প্রদানের জন্য তাদের আইনের আওতায় আনা যেতে পারে।

(৪) জাতীয় এবং অন্যান্য নির্বাচনে প্রার্থীর আয়-ব্যয় এবং অপ্রদর্শিত অর্থের ব্যবহার বন্ধ করা।

(৫) ব্যবসা এবং কর্মস্থলে নগদ অর্থের ব্যবহার বা লেনদেন বন্ধ করা।

(৬) অর্থ বিষয়ক তথ্যের আদান-প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

(৭) সরকারের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জোরদার করা।

(৮) অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বন্ধ করতে zero tolerance সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা।

(৯) রাজস্ব বিভাগের সংস্কার ও দুর্নীতি বন্ধ করার লক্ষ্যে সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

(১০) সরকারকে অনুন্নয়ন ব্যয় কমানোর পাশাপাশি সরকারী ব্যয়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।

(১১) সুবিধাভোগীরা যাতে কোন সুবিধা নিতে না পারে সেজন্য আইনের বিভিন্ন দুর্বল পথগুলো বন্ধ করা।

জ. পরিশিষ্ট

এরকম নাজুক পরিস্থিতি সত্ত্বেও অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ মর্যাদাপূর্ণ এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভ করেছে। উল্লেখ্য এই গ্রুপ International Financial Intelegence ইউনিটগুলোর সম্মিলিত একটি ফোরাম। এই ফোরাম মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য নিয়ে গবেষণা এবং তা সমদস্যদের মধ্যে বিনিময় করে। এই সদস্যপদ এন্টি মানি লন্ডারিং প্রয়াসে বাংলাদেশের জন্য একটা বড় অর্জন। কারণ, গত বছরগুলোতে দেশের ভেতরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম, অস্ত্র চোরাচালানের ট্রানজিট রুট হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার এবং কালোটাকা নিয়ে বাংলাদেশের যে ভাবমুর্তি, তাতে এগমন্ট গ্রুপের মতো ফোরামের সদস্যপদ লাভ এই ভাবমুর্তি পুনরুদ্ধারের পথে এক ধাপ অগ্রগতি।

বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিষয়ে আরও ১৩১ দেশের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়াতে পারবে এবং বিভিন্ন তথ্য বিনিময় করতে পারবে। এই মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য ৩৬টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত Financial Action Task Force (FATF) এর সুপারিশ আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ, মানি লন্ডারিং বিষয়ক এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশও FATF-এর সহযোগী সদস্য।

তবে এই সবকিছুর সাফল্য ও কার্যকরিতা নির্ভর করবে বাংলাদেশের ব্যক্তি পর্যায়ের অর্থ বিষয়ক তথ্য প্রবাহের অবাধ সুযোগ ও স্বচ্ছতার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার উপর।